Vol. 9 | No. 1 | 1965

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা সাহিত্যের কথা: প্রথম খণ্ড [প্রাচীনযুগ] ও বাংলা সাহিত্যের কথা: দ্বিতীয় খণ্ড [মধ্যযুগ]

Volume	9
Issue	1
Year	1965
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আহমদ শরীফ
Published online	June 15, 1965
DOI	10.62328/sp.v9i1.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v9i1.10
Pages	212-223
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

॥ গ্রন্থ-পরিচয় ॥

ক. বাংলা সাহিত্যের কথা : প্রথম খণ্ড [প্রাচীনযুগ]

দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত), এপ্রিল, ১৯৬৩ সন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮১। মূল্য : পাঁচ টাকা।

খ. বাংলা সাহিত্যের কথা : দ্বিতীয় খণ্ড [মধ্যযুগ]

প্রথম সংস্করণ, মার্চ, ১৯৬৫ সন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫২৩। মূল্য : বারো টাকা।

গ্রন্থকার : ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, প্রকাশক : মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্,

রেনেসাঁস প্রিন্টার্স-এ মুদ্রিত। ১০, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত।

এ যুগে 'ইতিহাস' সম্পর্কে ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। চৌদ্দ শতকের ইবন্ খলদুন ইতিহাসকে সমাজ প্রতিবেশ ও মানব-প্রবৃত্তির পরিপ্রেক্ষিতে বুঝবার রীতি চালু করতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তারপরে তাঁর অনুসারী দুর্লক্ষ্য। আজকের মানুষের বোধে ইতিহাস হচ্ছে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের মন, মনন ও আচরণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও শাস্ত্র। তাই এ কালের ইতিহাসের উৎস ও শ্রুতি ফল—দু-ই হচ্ছে সমাজতত্ত্ব। আজ ইতিহাস মনুষ্যসমাজের সর্বাত্মক ও সর্বাঙ্গীণ বিবর্তন ধারার সাক্ষ্যই নয় কেবল, কারক, কারণ-ব্যাখ্যাতা, শ্রুতিফলদাতা আর ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টাও। রাজা-বাদশার রাজনৈতিক ইতিবৃত্তের আদলে সর্ব প্রকার মনুষ্য-কৃতির ভাষ্য-ধর্মী ইতিহাস রচনার রেওয়াজ বিশেষভাবে চালু হয়েছে একালেই, যদিও আগের কালে এমনি প্রচেষ্টা বিরল হলেও অচিন্ত্য ছিল না।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার কাজ শুরু হয়েছে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকেই। কিন্তু আধুনিক সংজ্ঞার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজো আমরা

পাইনি। পুরোনো পদ্ধতিতে, নতুন-পুরোনো রীতির মিশ্রণে কিংবা নতুন ধরণে ইতিহাস লেখার প্রয়াস এক হিসেবে কম হয়নি। রামগতি ন্যায়রত্ন, হারাণ চন্দ্র রক্ষিত, রমেশ চন্দ্র দত্ত, দীনেশ চন্দ্র সেন, সুশীল কুমার দে, সুকুমার সেন, মনীন্দ্র মোহন বসু, যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, প্রিয় রঞ্জন সেন, নন্দ গোপাল সেনগুপ্ত, আশুতোষ ভট্টাচার্য, সুফিয়ান মুহম্মদ নাজিরুল ইসলাম, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মুহম্মদ এনামুল হক, ভূদেব চৌধুরী, ভোলানাথ ঘোষ, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, জনার্দন চক্রবর্তী, তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত, কালিদাস রায়, বুদ্ধদেব বসু, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, আবদুল লতিফ চৌধুরী, প্রমুখ বিদ্বান বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকে বিভিন্ন দিক থেকে পূর্ণতা দানের চেষ্টা করেছেন।

তবে এঁদের রচিত ইতিহাসের কোনোটা খণ্ড-প্রয়াসে সীমিত, কোনোটা খণ্ড-দৃষ্টির ফলে বিড়ম্বিত, কোনো কোনোটা দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতায় ব্যর্থ। কেউ দিয়েছেন রচনাকালের উপর গুরুত্ব, কারো দৃষ্টি পড়েছে বিষয় বস্তুর উপর, কেউ খুঁজেছেন সমাজতত্ত্ব, কেউ চেয়েছেন সাহিত্যরস, কেউবা সন্ধান করেছেন রাজ-নৈতিক ইতিহাস, কারো দৃষ্টি ছিল সাংস্কৃতিক বিকাশ ধারায় নিবদ্ধ, কেউ অনুসরণ করেছেন ধর্মবোধের বিবর্তন ধারা, কারো হাতে পেয়েছি আর্থিক অবস্থার বিশ্লেষণ, আর কেউ সন্ধান করেছেন বিদেশী প্রভাব। কিন্তু কারো রচনাই সর্বাঙ্গীণ প্রয়াসে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই আজো আমরা বাঙলা সাহিত্যের যুগোপযোগী আধুনিক ইতিহাস পাইনি।

রামগতি ন্যায়রত্ন, রমেশ চন্দ্র কিংবা হারাণ রক্ষিতের কালে উপাদান-উপকরণের অভাব ছিল। সে অভাব অনেকাংশে দূর করলেন মুখ্যত দীনেশ চন্দ্র সেন। ইতিহাস রচনায় তিনিই প্রথম সমাজ ও প্রশাসনিক প্রতিবেশ-সচেনতার পরিচয় দেন। ইংরেজী সাহিত্যের জনপ্রিয় ইতিহাসের অনুসরণে তিনি দণ্ড-ধরের নামে যুগবিভাগে তথা সাহিত্যের যুগ-লক্ষণ ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হন।

সুকুমার সেন হয়তো মনে করেন, মধ্যযুগের সব রচনার পুরো পরিচয় পাবার আগে যে-কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অসার্থক হওয়ার সম্ভাবনা, তাই তিনি

তাঁর ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে কবি ও কাব্যের কাল ও বিষয়ানুক্রমিক বিন্যাসেই তাঁর প্রচেষ্টা মুখ্যত সীমাবদ্ধ রেখেছেন। J. C. Ghose বাঙলা সাহিত্যের আলোকে সমাজ-মন ও সংস্কৃতির বিকাশ ও বিবর্তনধারা বুঝতে চেয়েছেন। গোপাল হালদার ও বুদ্ধদেব বসুরও লক্ষ্য ছিল তা-ই। কিন্তু তাঁদের তথ্যবিমুখতা অনেক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য নষ্ট করেছে। ভূদেব চৌধুরী ও অসিত বন্দ্যো-পাধ্যায়ের মধ্যে রয়েছে সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রশংসনীয় প্রয়াস, তবে তাঁদেরও কোনো কোনো সিদ্ধান্ত তথ্য ভিত্তিক না হয়ে হয়েছে আবেগ-আশ্রিত। মুহম্মদ এনামুল হকের ইতিহাসে সাহিত্যে শাসকগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রভাবের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রিয় রঞ্জন সেন ও নন্দ গোপালের ইতিহাস বাঙলা সাহিত্যের রূপ ও রস-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান দানের সার্থক প্রয়াসে বিশিষ্ট। তুলসী প্রসাদ ও কালিদাস রায়ের ইতিহাস পরীক্ষার্থীর প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে লেখা। মনীন্দ্র মোহন বসু লিখেছেন রামায়ণ-মহাভারত ও ভাগবতের ইতিহাস, আর আশুতোষ ভট্টাচার্য দিয়েছেন মঙ্গলকাব্যের, নাট্য-সাহিত্যের ও লোক-সাহিত্যের পরিচয়। বুদ্ধদেব বসু করেছেন আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন।

এ ছাড়া হিন্দু ইতিহাসকারগণ মুসলিম-রচিত সাহিত্যকে উপেক্ষা করেছেন, কেবল সুকুমার সেনের মধ্যে অবহেলা ছিল না। হিন্দু-পরিচালিত কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি কোন প্রতিষ্ঠানেরই মুসলিম-রচিত পুথি সংগ্রহের আগ্রহ ছিল না। তাই হিন্দু বাড়ির পুথি সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু পাশের মুসলিম ঘরে কোন খোঁজ করা হয়নি। একে নিতান্ত অবচেতন অবহেলা বলা চলে না, সচেতন উপেক্ষাই বলতে হয়। তাই আলাউল-কাজী দৌলতের সৌজন্যমূলক নামোল্লেখেই মুসলিম-সাধনার ইতিহাস সমাপ্ত হয়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'য় নজরুলের নামও ঠাঁই পায় না, কলকাতার মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্য-সূচীতে বাংলা সাহিত্যের যে-ইতিহাস রয়েছে, তাতে আলাউল-কাজী দৌলেতেরও নাম নেই।

সঙ্গতকারণেই হয়তো মুসলমান সমাজে দেখা দিল এর প্রতিক্রিয়া। প্রতিক্রিয়াই বা বলি কি করে! হিন্দু ঐতিহাসিক যখন দায়িত্ব নিলেন না, তখন মুসলমানকেই এগিয়ে আসতে হলো তাঁদের দানের

পরিচয় দিতে। এ ভাবে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মুহম্মদ এনামুল হক, সুফিয়ান মুহম্মদ নাজিরুল ইসলাম, আবদুল লতিফ, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলি আহসান, কাজী আবদুল মান্নান, আনিসুজ্জামান প্রমুখ সবাই বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলিম সাধনার পরিচায়ক গ্রন্থ রচনা করলেন। হিন্দুদের কেউ কেউ যেমন মুসলমানদের শাসন ও সংস্কৃতির কোন প্রভাব বা দান স্বীকার করতে অনিচ্ছুক; তেমনি সুফিয়ান সাহেবও এদেশের যা কিছু ভাল, তা হয় অনার্য অথবা আরবী-ইরানী বলে চালিয়ে দিতে চান। এঁদেরও কেউ বাঙলা সাহিত্যের সামগ্রিক ইতিহাস রচনায় প্রয়াসী হলেন না। কার্যত বাঙলার হিন্দু-সাহিত্য ও মুসলমান-সাহিত্যের আলাদা আলাদা ইতিহাস গড়ে উঠেছে। অনেকটা বৃটিশ ও আমেরিকান সাহিত্যের ইতিহাসেরই মতো। তবু মুসলমানদের উদারতা অতুল্য। কেননা, তারা আজো জিজ্ঞাসা নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে হিন্দু-রচিত সাহিত্য পড়ে, স্কুলে-কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়, পশ্চিমবঙ্গীয়রা কিন্তু তা করে না, ক্ষতি অবশ্য তাদেরই। কেননা, শুভ হয় না জ্ঞান-বিমুখতার পরিণাম। ইতিহাস তার সাক্ষী। চোখ বুজে থাকলেই সত্য-সূর্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না, তার প্রসাদ থেকে কেবল নিজেকেই বঞ্চিত রাখা হয়।

এদেশে এমন অনন্য উদারতার পরিচয় দিয়েছেন দু'জন গুণী পুরুষ। একজন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ—যিনি হিন্দু-মুসলমান অবিশেষের পুথি সংগ্রহ করেছিলেন এবং হিন্দু-মুসলমান ভেদবুদ্ধির উর্ধ্বে থেকে হিন্দু ও মুসলমান কবির কাব্যের পরিচিতি দানে ও সম্পাদনা কার্যে আজীবন ব্রতী ছিলেন; অপরজন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—যাঁর আলোচনার ও গবেষণার ক্ষেত্র একদিকে বেদ থেকে কোরআন এবং অপরদিকে সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত-উর্দু-হিন্দি থেকে আরবী-ফারসী অবধি বিস্তৃত। চর্যাপদ নিয়েই তাঁর সাধনার শুরু আর ভাষাতত্ত্বের জটিল সমস্যার সমাধানে তার উত্তরণ। উমর খৈয়াম, বিদ্যাপতির পদ পরিচিতি, চণ্ডীদাস সমস্যার সমাধান, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও চর্যাগীতির পাঠ নিরূপণ, কথ্য-আর্যভাষা ও গৌড়ী প্রাকৃত-তত্ত্ব প্রভৃতি তাঁর সাধনার বিশেষ ফসল।

দুই বঙ্গে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ই আজ অবধি একমাত্র মানুষ, যিনি সমদৃষ্টি ও সমান গুরুত্বে গ্রহণ করেছেন বাঙলা সাহিত্যের সব রচনা। এবং

প্রাচীনকাল থেকে আঠারো শতক অবধি বাঙলা সাহিত্যের একটি সামগ্রিক পরিচয় দিয়েছেন দুই খণ্ডে। তাঁর ইতিহাস এদিক দিয়ে বিশিষ্ট।

শহীদুল্লাহ্ সাহেবের এ গ্রন্থের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের কয়েকজন বিশিষ্ট কবির আবির্ভাব কাল নিরূপণ,—বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস প্রভৃতি আলোচনা কর্তব্য।

এ গ্রন্থের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ১-১৪২, ৩৬২-৯৬, ৪১৮-৮০ পৃষ্ঠার আলোচিত অংশগুলি গ্রন্থকারের মৌলিক গবেষণা-প্রসূত।

শহীদুল্লাহ্ সাহেব রচিত প্রাচীন 'বাংলা সাহিত্যের কথা' এবং মধ্যযুগের 'বাংলা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থ-দুটোকে কোন শ্রেণীর অন্তর্গত করে দেখা দুঃসাধ্য। কেন না, দুটোই মুখ্যত বিভিন্ন সময়ে লিখিত গবেষণা মূলক কতগুলো বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সমষ্টি। চর্যাগীতি, ধর্মমঙ্গল, নাথ-সাহিত্য ও লোকসাহিত্য প্রভৃতির আলোচনায় ধর্ম ও সমাজের আলেখ্যদানের চেষ্টা থাকলেও মুখ্যত ভাষাস্বরূপ নিরূপণ ও কাল নির্ণয়ই এর লক্ষ্য। পড়ে পণ্ডিতের জ্ঞান বাড়ে, তবে সাধারণ শিক্ষার্থীও যে একটা সামগ্রিক ধারণা পায় না, তা নয়।

দ্বিতীয় খণ্ডেও রয়েছে বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সংকলন। এজন্যে ১-১৪২ পৃষ্ঠা অবধি আলোচনা অসংলগ্নতায় আড়ষ্ট; যদিও রাজনৈতিক পটভূমিকার সেতু সে-বিচ্ছিন্নতা বিলোপের সহায়ক হয়েছে। বড়ুচণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস সমস্যা, শেখ কবীরের একটি পদ, কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর কে, শ্রীকরনন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর, মহাকবি সৈয়্যদ সুলতান ও কবি মুহম্মদ খান প্রভৃতির সম্বন্ধে নানা সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে তাঁকে বিতর্কে নামতে হয়েছে। এবং সেই বিতর্কও গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এসব ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তগুলো বিধৃত হলেই সাধারণ পাঠক উপকৃত হতো, কেননা, প্রাথমিক জ্ঞানের অভাবে গবেষণার দুরূহ জটিল পথ অতিক্রম করা সাধারণের পক্ষে দুঃসাধ্য। তবু 'চণ্ডীদাস এবং চণ্ডীদাস সমস্যা' শহীদুল্লাহ্ সাহেবের অবিস্মরণীয় অবদান বলেই বিবেচিত হবে চিরকাল।

সমাজতাত্ত্বিক, ধর্মতাত্ত্বিক কিংবা অর্থনীতিবিদের দৃষ্টি নিয়ে লেখা নয় এ ইতিহাস। ভাষাতাত্ত্বিক, সাহিত্যরসিক ও সংস্কৃতিবিদের রচনা এটি। তাই

এতে বাঙলার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর বিদেশী প্রভাবের প্রাসঙ্গিক উল্লেখও রয়েছে। বহুভাষাবিদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের পক্ষেই এসব সহজে সম্ভব। সূচীপত্র উদ্ধৃত করলেই এ ইতিহাসের গঠন-প্রকৃতি, রচনা-পদ্ধতি ও গবেষণা-প্রাধান্য সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা দেয়া যাবে।

'বাংলা সাহিত্যের কথা' (প্রথম খণ্ড) প্রাচীন যুগ :

১. উপক্রমণিকা ; ক. বাংলা ভাষার জাতি ; খ. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কত দিনের ? গ. প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের ধারা ২. নাথ পন্থা ৩. নাথগীতিকা ৪. নাথসিদ্ধাগণ ৫. তান্ত্রিক বৌদ্ধমত ও সহজযান ৬. চর্যাগানের সাহিত্যিক মূল্য ৭. বৌদ্ধযুগে বাঙলার সমাজচিত্র ৮. বৌদ্ধগানের ভাষা ৯. ধর্মপূজা, ১০ ধর্ম সাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্ব, ১১. শূন্যপুরাণ ও তাহার লেখক ১২. ধর্মমঙ্গল ১৩. ধর্মমঙ্গলে হরিশ্চন্দ্র পালা ১৪. ময়ূর ভট্ট ১৫. লাউসেনের কাহিনী ১৬. লোক-সাহিত্য : রূপকথা, ব্রতকথা, ছড়া, ডাক ও খনার বচন, হিয়াঁলী ও প্রবাদ ১৭. পরিশিষ্ট—ক. চর্যাপদের ব্যাকরণ, খ. চর্যাপদের ছন্দ।

'বাঙলা সাহিত্যের কথা' (দ্বিতীয় খণ্ড) মধ্য যুগ :

১. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের রাজনৈতিক পটভূমি : ক. পাঠান আমল ১২০১-১৫৭৬। খ. মোগল আমল ১৫৭৭-১৮০০। ২. মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের ধারা, ৩. বড়ু চণ্ডীদাস ৪. চণ্ডীদাস সমস্যা ৫. শেখ কবীরের একটি পদ ? ৬. মুসলমান পদকর্তৃগণ ৭. হিন্দু-পদকর্তৃগণ ৮. বিদ্যাপতি ৯. কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর কে ? ১০. শ্রীকর নন্দী কবীন্দ্র পরমেশ্বর ১১. গোরক্ষ বিজয়ের রচয়িতা ১২. ময়নামতীর গান ১৩. মহাকবি সৈয়দ সুলতান ও কবি মুহম্মদ খান ১৪. মহাকবি আলাওল ১৫. মধ্যযুগের কাব্যের উপজীব্য আখ্যান (মানসা মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, বিদ্যা ও সুন্দর, সত্যপীর, হিন্দু উপাখ্যান, মুসলমান উপাখ্যান)। ১৬. মনসামঙ্গলের কবিগণ ১৭. চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ ১৮. ধর্মমঙ্গলের কবিগণ ১৯. কালিকা মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের কবিগণ

২০. সত্যপীরের পাঁচালীর কবিগণ ২১. অন্যান্য মঙ্গল কাব্য, ২২. চৈতন্য সাহিত্য ; ২৩. মুসলমানী পুথি সাহিত্য ২৪. অনুবাদ-সাহিত্য—আরবী, ফারসী, উর্দূ-হিন্দি ও সংস্কৃত থেকে অনূদিত গ্রন্থাবলী পরিচিত (একশ পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচনা) ২৫. লোকসাহিত্য (৭৫ পৃষ্ঠা জুড়ে আলোচনা) ২৬. খণ্ডকাব্য, চৌতিশা ২৭. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান অবদান। গ্রন্থপঞ্জী।

এর মধ্যে প্রথম খণ্ডের রচনাগুলো মুখ্যত গবেষণা-প্রসূত। আর দ্বিতীয় খণ্ডের পরিচ্ছেদগুলি প্রধানত পরিচিতিমূলক। তার মধ্যে 'শেখ কবীরের একটি পদ' ও 'সৈয়্যদ সুলতান' প্রতিবাদ-জ্ঞাপক।

॥ ২ ॥

প্রথম খণ্ডে রয়েছে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত প্রসূত ও প্রভাবিত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। এ তাঁর জীবনব্যাপী গবেষণা ও সাধনার ফসল। এ ক্ষেত্রে সম্প্রতি তিনিই চক্রবর্তী। প্রথম খণ্ডের পরিচ্ছেদগুলো বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সমষ্টি হলেও একটা সামগ্রিক ঐক্যে সমন্বিত। এতে চর্যাপদ ও পদকার, নাথপন্থ, নাথসাহিত্য, নাথসিদ্ধা এবং ধর্মঠাকুর-কেন্দ্রিক মত ও সাহিত্য আর রচয়িতাদের সম্বন্ধে তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্য পরিবেশিত। বিশেষ করে চর্যাপদাবলী ও পদকারদের সম্পর্কে তাঁর অর্ধশতাব্দকালের ভাব-ভাবনা ও গবেষণার সুপরিণত ফল এতে বিধৃত। নাথপন্থও যে বিকৃত বৌদ্ধমতের প্রশাখা তা' তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন। নাথপন্থা, নাথগীতিকা ও নাথসিদ্ধাদেরও প্রায়-পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দানের প্রয়াসে গ্রন্থখানির উপযোগ বেড়েছে। বিশেষকরে তান্ত্রিকবৌদ্ধমত ও সহজযান, চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্য, বৌদ্ধযুগে বাঙলার সমাজচিত্র, বৌদ্ধগানের ভাষা, চর্যাপদের ভাষা, চর্যাপদের ছন্দ প্রভৃতি পরিচ্ছেদ বিদ্যার্থীদের কাছে যে গ্রন্থটির গুরুত্ব অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর যে-কোন বিদ্বানকে আকৃষ্ট করবে 'ধর্মসাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্ব' ও 'লোক-সাহিত্য' নামের অধ্যায় দুটো। এ খণ্ড সম্পর্কে আমরা পূর্বেও একবার আলোচনা করেছি।[১]

নতুন করে বলছি এ জন্যে যে এ সংস্করণ যথার্থ অর্থেই 'পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত।' এবং বলতে দ্বিধা নেই যে এ গ্রন্থের মান ও গুরুত্ব — আর সে কারণেই উপযোগ — বহুগুণ বেড়ে গেছে। এ সঙ্গে তাঁর যশঃরশ্মিও হয়েছে উজ্জ্বলতর। এখণ্ডটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী কীর্তিসৌধ রূপে শোভা পাবে — এ বিশ্বাস আমাদের দৃঢ়। আগের বারেই বলেছি, জটিল বিষয়কে তরল করে বলবার মতো ভাষার যাদুকাঠি রয়েছে তাঁর আয়ত্তে।

॥ ৩ ॥

পূর্বেই বলেছি, দ্বিতীয় খণ্ডও মুখ্যত প্রবন্ধ সমষ্টি। অবশ্য অশতিবর্ষের এই জ্ঞানবৃদ্ধ নতুন করে লিখেছেন চৈতন্য-সাহিত্য, অনুবাদ-সাহিত্য ও লোক-সাহিত্য নামের অধ্যায় তিনটে। এখণ্ডটি প্রধানত পরিচিতিমূলক হলেও এতেও গবেষণা ও বিতর্কলব্ধ নতুন সিদ্ধান্তের অভাব নেই। এর 'অনুবাদ-সাহিত্য' অধ্যায়টি তত্ত্বে ও তথ্যে ঋদ্ধ। চৈতন্য-সাহিত্যেও তিনি অনেক বিষয়ে নতুন আলোকপাত করেছেন।

কোনো মানুষই সর্বজন গ্রাহ্য শেষ কথা বলতে পারেন না। দৃষ্টি ও মতের বিভিন্নতা থাকবেই, আর তা কাম্যও বটে। নইলে বৃথা হতো জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা। সঞ্চিত তথ্য নতুন চোখে নতুন তত্ত্ব-সুষমা লাভ করবে — এ আশা-আশ্বাসইতো মানুষকে যুগে যুগে দেশে দেশে ব্রতী করে এ কঠিন আয়ু-ক্ষয়ী কাজে।

ছোট-খাট বিষয়গুলো বাদ দিয়ে তিনটি বিষয়ে আমরা লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। জানি ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের পাশাপাশি ভিন্নমত প্রকাশ করা অর্বাচীনের ঔদ্ধত্যের মতো শোনাবে, তবু আমাদের যুক্তিগুলোর কোনো একটি তাঁর পক্ষে গ্রহণীয় হতেও পারে, এ ক্ষীণ আশায় এখানে পেশ করছি :

ক. সৈয়দ সুলতান ও মুকুন্দরামের কাব্য-রচনা-কাল নির্ণয় কালে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ বলেছেন 'কিন্তু সংস্কৃতে রস দ্বারা ৯ সংখ্যা বুঝায়। বাংলা সাহিত্যে রস=৯ আছে কি?" (পৃঃ ১২৩)। আবার লিখেছেন "সংস্কৃত অভিধান মতে 'রস' অর্থে ছয় সংখ্যা বোঝায়। ··· অধিকন্তু রস অর্থে নয় সংখ্যা সংস্কৃত অভিধান মতে হয় না।" (পৃঃ১৯৪) —'এ দুটো উদ্ধৃতির মধ্যে

যে অসঙ্গতি রয়েছে, তা' সম্ভবত অধ্যায় দুটো রচনার কালিক ব্যবধানের এবং পরিবেশনের স্থানিক দূরত্বের ফল।

কিন্তু রাম (১,৩), ভুবন (১,৩,১৪), রস (৬,৯), গগন (১,৭) যুগ (২,৪) প্রভৃতি কয়েকটি সংখ্যা-প্রতীক শব্দের মান বক্তার অভিপ্রায় অনুসরণেই নিরূপণ করতে হয়। হিন্দুর রচনায় গগন=১, যুগ=৪, আর মুসলমানের প্রয়োগে সাধারণভাবে গগন=৭, যুগ=২।[২] বাংলায় রস যে ৯ সংখ্যাও নির্দেশ করে তা' আলোচ্য গ্রন্থে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ও মেনে নিয়েছেন: 'রসের উপরে রস তাহে রস দেহ'—(রূপরাম)-এর থেকে তিনি ৯৯৯ হিজরী সন বের করেছেন (পৃঃ ২০৩)।

হাতের কাছে পেয়ে আর একটি নজির দিচ্ছি। আলাউল তাঁর 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল' কাব্যের রচনাকাল নির্দেশ করেছেন 'রস' এর মান ৯ ধরে:

'মৃগাঙ্ক গগন রস করিয়া স্থাপন।'

এতে মৃগ —১, অঙ্ক — ০, গগন — ৭, রস — ৯=১০৭৯ তথা ১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দ নির্দেশিত হয়েছে।[৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মুসলমানের 'সাত আসমান'-এর কথা মনে পড়েনি বলে ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন, 'ইহা হইতে তারিখ উদ্ধার অসম্ভব।'[৪] আশরাফ হোসেন সাহিত্য-রত্ন পরিবেশিত তথ্যের অসারতা প্রমাণের জন্যেই মুখ্যত সৈয়দ সুলতান সম্বন্ধে এ আলোচনার অবতারণা। ফলে কবি ও কাব্য পরিচিতি অলিখিতই রয়ে গেছে। সৈয়দ সুলতানের নিবাস ও কাল সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য[৫] যখন মিলেছে, তখন এ বিতর্কের প্রয়োজন সামান্য।

খ. ডক্টর শহীদুল্লাহ্র মতে 'কবি শেখর'ই লিপিকর প্রমাদে 'শেখ কবির' হয়েছেন। (পৃঃ ৬৬—৬৯)। কিন্তু তিনিই স্বীকার করেছেন, "বাস্তবিক কবীর[৬] নামে একজন পদকর্তা ছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে তাঁহার হোলি খেলার একটি পদ আছে।" (পৃঃ ৬৯)। কবিশেখর ও বিদ্যাপতির নামে চালু পদটি ব্রজবুলিতে লেখা। কবীরের পদটির ভাষাও ব্রজবুলি।[৭] এমনও তো হতে পারে অপরিচিত মুসলমান 'শেখ কবির' নামটি বৈষ্ণব-পদ সংকলয়িতারা সুপরিচিত 'কবিশেখর' উপাধির লিপিকর প্রমাদ মনে করে সংশোধন করেছেন এবং 'কবি শেখর'-এর পরিবর্তে উক্ত উপাধিধারী বিদ্যাপতি নামটি অপর কোনো

লিপিকর বা পদসংকলক বসিয়ে দিয়েছেন ! ষোল শতকে মুসলিম পদকর্তার বিরলতা এই সম্ভাবনার অনুকূল। দৌলত উজির, আফজল, চাঁদকাজী, মীর ফয়জুল্লাহ, সৈয়দ সুলতান, ফতেখান প্রভৃতি ষোল শতকের কবিগণের ব্রজবুলি পদও মিলেছে। কাজেই কবীর ও শেখ কবীর অভিন্ন ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব নয়, — এ অনুমানই সম্প্রতি সমীচীন বলে মনে হয়।

গ. শহীদুল্লাহ্ সাহেব সাবিরিদ খানের 'বিদ্যাসুন্দর'কে দ্বিজশ্রীধরের গ্রন্থের অনুকৃতি বলে সাব্যস্ত করেছেন (পৃঃ ২২০-২২২)। আমাদের মতে একই সংস্কৃত গীতিনাট্যের অনুবাদ বলেই উভয়ের রচনায় সাদৃশ্য দেখতে পাচ্ছি ; কেউ কারো অনুকারক নন। তিনিই বলেছেন, 'দ্বিজশ্রীধর ও সাবিরিদ খানের কাব্য চট্টগ্রামে পাওয়া গিয়াছে। খুব সম্ভবতঃ তাঁহারা ঐ অঞ্চলের অধিবাসী-ছিলেন।'' (পৃঃ ২২০)। তা-ই যদি হয়, তা হলে প্রায়-সমকালীন কবি (পৃঃ ২২২) সাবিরিদ খানের পক্ষে দ্বিজ শ্রীধরের রচনা আত্মসাৎ করা অসম্ভব। বিশেষ করে সাবিরিদ খান যখন 'রসুলবিজয়' ও 'হানিফার দিগ্বিজয়' নামের দু'খানা কাব্য রচনা করতে জেনেছেন, তখন 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যটি নকল করছেন, এ কথা মানতে হলে অনেকখানি মানস-প্রবণতার প্রশ্রয় প্রয়োজন।

ঘ. দৌলত উজির বাহরাম খানের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অপরিবর্তিতই রয়েছে। কেননা ষোলশতকেও নিযামপুর পরগণার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় প্রমাণ মিলেছে 'বাহারিস্তান গয়বীত'তে। এ সম্বন্ধে আমরা আমাদের সংগৃহীত তথ্য, প্রমাণ ও যুক্তি অন্যত্র [৮] পেশ করেছি। মুঘলবিজয়ের পর চট্টগ্রামের অন্য নাম হ'ল 'ইসলামাবাদ।' দৌলত উজিরে পাচ্ছি ফতেয়াবাদ। কাজেই 'আওরঙ্গজেব প্রশস্তি' (পৃঃ ৩৩৭) প্রক্ষিপ্ত।

'মুখবন্ধে' লেখক বলেছেন, ''আমি আমার বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী এই পুস্তক খানি রচনা করিয়াছি। ... আমি ইহাতে কোনও কোনও স্থানে আমার স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়াছি এবং আমার পূর্বসূরিগণের নিকট আমি পদে পদে ঋণী।' —দুটো উক্তিই যথার্থ। প্রবীন ও নবীন কোনো গবেষকই উপেক্ষিত হননি, এবং অবেহেলা পায়নি কোনো প্রকটিত তথ্যও।

আর 'আমার দোষত্রুটি সম্বন্ধে আমি অবিদিত নহি' — এ স্বীকৃতি শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মতো সত্যনিষ্ঠ সরল পণ্ডিত-মনীষীর পক্ষেই সহজে সম্ভব।

সব ভাল লেখার পেছনে থাকে সুবিন্যস্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত মন। এ লেখার পেছনেও পাই একটি সত্যসন্ধ উদার, সরল ও সুন্দর মন; মাতৃভাষার প্রতি মমতা-স্নিগ্ধ এক রসিক চিত্ত—যা' গুণগ্রাহিতার ঐশ্বর্যে আর উদারতায় সরস এবং সাবলীল। প্রথম খণ্ডে তারই প্রকাশ দেখি মলাট-শীর্ষে 'মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলাভাষা'-র মতো মনমাতানো উদ্ধৃতিতে আর এদেশের সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় অন্যতম পথিকৃৎ দীনেশচন্দ্র সেনকে স্মরণে এবং এর পরেও মধুসূদনের 'বঙ্গভাষা' নামের চতুর্দশপদী কবিতার সামগ্রিক উৎকলনের আগ্রহে। আর দ্বিতীয় খণ্ডে এরই অনুসৃতি পাই নিধুবাবুর 'নানান দেশের নানান ভাষা, বিনে স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা' ইত্যাদির উদ্ধৃতিতে এবং দেশ ও ভাষাপ্রাণ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞচিত্তের শ্রদ্ধা নিবেদনে। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের এ খণ্ডেও তাঁর পাণ্ডিত্য-খ্যাতি অম্লানই রইল।

প্রথম খণ্ডের প্রচ্ছদ সুন্দর ও উজ্জ্বল। মলাট শোভন। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রচ্ছদ ম্লান। মুদ্রন-প্রমাদও দুর্লক্ষ্য নয়। নির্ঘণ্ট ও সম্পূর্ণ গ্রন্থ-পঞ্জীর অভাব এ ধরনের গ্রন্থের উপেক্ষণীয় ত্রুটি নয়। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের কাছে অবশ্য তাঁর এ বয়সে নির্ঘণ্ট তৈরীর মতো কাজ আশা করে না কেউ। এ দায়িত্ব প্রকাশকেরই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় ছিল। তবু প্রকাশকের কল্যাণে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের এই খণ্ড দুটো শহীদুল্লাহ্ সাহেবের গবেষণামূলক শ্রেষ্ঠ কৃতি রূপেই স্মরণীয় হয়ে থাকলো।

আহমদ শরীফ

॥ টীকা ॥

১. সাহিত্য-পত্রিকা ঃ ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা ঃ ১৩৬৫ সন।
২. আলাউল—তোহ্‌ফা ঃ ভূমিকা ১০৫, ১০৯, ১৩০।
৩. ঐ ঐ পৃঃ ১০৯।
৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড অপরার্ধ, ৩য় সং পৃঃ ৩৩৮ পাদটীকা।
৫. সত্য-কলি বিবাদ সংবাদ—ভূমিকা।
৬. ক. বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি'—যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫৩, ২সং, ১৩৬২ সন।
   খ. মুসলিম কবির পদ সাহিত্য ঃ পৃঃ ৮৯।
৭. ক. পদ কল্পতরু পৃঃ ১৩০ (১ম খণ্ড) খ. রাজতরঙ্গিনী পৃঃ ৪৪-৪৫,
৮. ক. কবি দৌলত উজির ও মোহাম্মদ খান সম্বন্ধে নতুন তথ্য ঃ সাহিত্য পত্রিকা। শীত, ১৩৬৯ সন।
   ঘ. লায়লীমজনু রচনার তারিখ ঃ ডক্টর আবদুল করিম ঃ বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭০ সন।

॥ ২ ॥

মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭—১৯১৮)।

পৃষ্ঠা বারো+৫২৬; ডঃ আনিসুজ্জামান প্রণীত, লেখক সঙ্ঘ প্রকাশনী, বর্ধমান হাউস, ঢাকা — ২,
আশ্বিন ১৩৭১ (অক্টোবর, ১৯৬৪); মূল্য : আট টাকা মাত্র।

বইখানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি উপাধির জন্য অনুমোদিত গবেষণাগ্রন্থ 'ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানের চিন্তাধারা'র (১৭৫৭—১৯১৮) কিঞ্চিং পরিবর্তিত আকার। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত: প্রথম ভাগের চারটি অধ্যায়ে 'দেশ ও কাল' শিরোনামায় ১৭৫৭—১৮০০, ১৮০১—১৮৫৭, ১৮৫৮—১৯০৫, ১৯০৫—১৯১৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাঙালী মুসলমানদের ঐতিহাসিক পটভূমিকা বর্ণনা করা হয়েছে এবং এতে মুসলমানদের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক অবস্থাদি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের ভূমিকার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগের ছয়টি অধ্যায়ে মুসলমানদের সাহিত্য ও চিন্তাধারার পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সমালোচনা প্রবন্ধ প্রথম ভাগের বা ঐতিহাসিক পটভূমিকার আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকবে।

গ্রন্থকার ঠিকই বলেছেন যে "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অবদানে সমৃদ্ধ। এর তুলনায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানদের পশ্চাৎপদতা বিস্ময়কর। বাংলা সাহিত্যের উৎসাহী পাঠক মাত্রই লক্ষ্য করেছেন যে ১৮০০ থেকে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতি পর্বে — বাঙালী মুসলমান সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয়।" (পৃঃ এক) এই নিষ্ক্রিয়তার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্যে তিনি বাঙালী মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাসের কয়েকটি দিক আলোচনা করেছেন, কারণ "একমাত্র সামাজিক ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বাঙালী মুসলমাদের এই অবস্থা-সংকটের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।" (পৃঃ এক)

মোটামুটিভাবে গ্রন্থকার যা বলতে চেয়েছেন তা হচ্ছে এই : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতি পর্বে মুবলমানদের নিষ্ক্রিয়তার প্রধান কারণ তাদের আর্থিক

দুর্বলতা ; আর্থিক দুর্বলতার জন্য তারা আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ইংরেজী শিক্ষা লাভে বঞ্চিত ছিল এবং ফলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে অপরিচিত ছিল। এই সময়ে মুসলমানদের মধ্যে যে-সব "ভাব-আন্দোলন" দেখা দিয়েছিল, সেগুলি ছিল পশ্চাৎ-পন্থী অর্থাৎ তাদের "মূলে ছিল প্রাচীন ধর্ম-জীবনের আদর্শে ফিরে যাবার ইচ্ছা" ; এই সব আন্দোলন মুসলমানদের সঙ্গে "আধুনিক জীবন ও জগতের বিচ্ছেদ ঘটায়" ; সুতরাং লেখকের মতে মুসলমানদের আর্থিক অসচ্ছলতাই তাদের শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসরতার মূল কারণ এবং এই কারণেই মধ্য-যুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের বিশেষ অবদান থাকা সত্ত্বেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতি পর্বে তাদের বিশেষ কোন অবদান লক্ষণীয় নয়।

এখন প্রশ্ন উঠে, মুসলমানদের আর্থিক দুর্গতির কারণ কি? গ্রন্থকারের মতে এর কারণ বাংলা দেশে ইংরেজদের শাসন এবং শোষণ-নীতির ফলে চাষী মজুররা সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মুসলমান-প্রধান বাংলা দেশে "ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থায় সাধারণ প্রজাদের যে দুর্দশার কথা আমরা বলেছি, ঘটনাক্রমে তাদের অধিকাংশই ছিলেন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী।" (পৃঃ ৯) এই মতবাদ স্থাপন করতে গিয়ে গ্রন্থকার মুসলমানদের আর্থিক দুর্গতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রচলিত মতবাদ বর্জন করেছেন। যেমন, তিনি বিশ্বাস করেন না যে, ১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হিন্দু জমিদারেরা মুসলমান জমিদারদের স্থলাভিষিক্ত হয়। ২. লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির ফলে মুসলমানেরা হিন্দুদের চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৩. মুসলমান বিদ্বেষ কোম্পানী শাসনের সরকারী নীতি ছিল বা শাসন ক্ষমতা হারাবার পরে মুসলমানেরা ইংরেজ বিদ্বেষী হয়ে পড়ে। ৪. মুসলমানেরা ইচ্ছা করে ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করে।

এখন প্রশ্নগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হিন্দু জমিদাররা মুসলমান জমিদারদের স্থলাভিষিক্ত হয় কি-না? এ বিষয়ে গ্রন্থকারের মত সুস্পষ্ট ; তিনি বলেন, "নবাবী আমলে জমিদার বলে যাদের আখ্যা দেওয়া যেত, তাঁদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা কম। ইংরেজ আমলে পুরোনো জমিদারের বদলে নতুন জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। .... ঘটনাক্রমে নতুন জমিদারেরা সকলেই আসেন হিন্দু সমাজ থেকে,

কিন্তু পুরোনো যুগেও আধিপত্য ছিল তাঁদের।" (পৃঃ পাঁচ) তাঁর নতুন মতবাদ স্থাপন করতে গিয়ে গ্রন্থকার নওয়াবী আমল থেকে অর্থাৎ নওয়াব মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে আলোচনা শুরু করেছেন এবং দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে ১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে বৃহত্তর ১৫টি জমিদারীর মধ্যে ২টি এবং ২১টি ছোট জমিদারীর মধ্যে ২টি ছিল মুসলমানদের হাতে। (পৃঃ ১০) তিনি আরও বলেন "উচ্চ সরকারী চাকুরীতে এতদিন পর্যন্ত উত্তর ভারতীয় মুসলমানদেরকেই নিয়োগ করা হত : এই প্রথার ব্যতিক্রম করে তিনি [মুর্শিদকুলী খান] সেই সমস্ত ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করার দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পরবর্তী নবাবেরা এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন।" (পৃঃ ৪) বলা বাহুল্য তাঁর এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তির জন্য তিনি জেমস গ্র্যাণ্ট-এর Analysis of the Finances of Bengal এবং স্যর যদুনাথ সরকারের History of Bengal, Vol. II-এর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছেন। (যদুনাথ সরকার আবার সলিমুল্লাহ্‌র "তওয়ারীখ ই-বাঙ্গালা"-এর উক্তির উপর নির্ভর করেছেন।)। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেননি যে জেমস্ গ্র্যাণ্ট বাংলা দেশের সকল জমিদারের নাম উল্লেখ করেননি এবং যদুনাথ সরকারের উক্তি জমিদারদের জন্য প্রযোজ্য নয়, বরং পদস্থ হিন্দু কর্মচারীদের উপর প্রযোজ্য ; তাছাড়া যদুনাথ সরকারের তথ্য নির্দেশক সলিমুল্লাহ্‌র উক্তি কতখানি নির্ভরযোগ্য তাও প্রণিধান করার প্রয়োজন রয়েছে, কারণ সলিমুল্লাহ্ মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর ৩৬ বছর পরে ইংরেজ গভর্নর হেনরী ভ্যানাসটার্ট-এর আদেশে বইখানি রচনা করেন। কোম্পানী দিওয়ানী লাভের প্রথম আমলের ইংরেজ লেখকগণ এবং উচ্চপদস্থ ইংরেজ অফিসাররা মুর্শিদকুলী খানের শাসন ব্যবস্থা তথা মোগল শাসন ব্যবস্থাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সলিমুল্লাহ্‌র বই খানিকে তথ্য স্বরূপ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ সলিমুল্লাহ্‌র বইখানি ইংরেজ শাসকদের প্রচারপত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সে যাই হউক আরও অগ্রসর হওয়ার পূর্বে মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক হিন্দুদের নিয়োগের বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক্। সম্রাট আওরঙ্গযেবের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে পর পর কয়েকটি গৃহযুদ্ধের ফলে দিল্লীর ক্ষমতাও খর্ব হতে থাকে ; ফলে ঐ সময় থেকে দিল্লী থেকে উচ্চ পদস্থ মুসলমান কর্মচারী প্রদেশসমূহে পাঠানো প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এর প্রত্যক্ষ ফল

বাংলা দেশে হিন্দু অফিসার নিয়োগ। দ্বিতীয়তঃ কলকাতায় কোম্পানীকে ঘিরে একদল হিন্দু বানিয়া শ্রেণী গড়ে উঠছিল; তাদের ঠেকাবার উদ্দেশ্যেও মুর্শিদকুলীখান মুর্শিদাবাদে আর একদল হিন্দু কর্মচারী শ্রেণী গড়ে তোলেন। তবু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে মুর্শিদকুলী খানের সময় কোন হিন্দু প্রশাসনিক বা সামরিক বিভাগে ফৌজদার ইত্যাদি উচ্চপদ পায়নি; কোন হিন্দু দিওয়ান বা নায়েব-দিওয়ানের পদও পায়নি। রাজস্ব বিভাগে নিম্ন শ্রেণীর চাকুরীতে (যেমন কানুনগো, আমিন, পাটওয়ারী ইত্যাদি) সর্বদাই হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। মুর্শিদকুলী খান শুধু তাদের দু'একজনকে পদোন্নতি দান করেন, তবুও হিন্দুরা মুসলমানদের তুলনায় অনেক নীচু ছিল। হিন্দুরা রায়রায়য়ানের পদ পায় মুর্শিদকুলী খানেরও পরে।

আমার মনে হয় ডঃ আনিস জেম্‌স গ্র্যান্টেরও ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। গ্র্যান্ট কোথাও বলেননি যে বাংলা দেশে মাত্র ১৫টি বড় এবং ২১টি ছোট জমিদারী ছিল (প্রকৃত পক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বাংলা দেশের জমিদারীর সংখ্যা হাজারেরও বেশী ছিল)। পক্ষান্তরে গ্র্যান্ট ভূমি-রাজস্বের হিসাবের জন্য পরগনাগুলিকে খালসা এবং জাগীর রূপে ভাগ করেন। খালসার অংশের ভাগ নিম্নরূপ ছিল:

১. প্রথমে ১—১৫ নং পর্যন্ত ১৫টি বড় জমিদারী; এদের মধ্যে ২টি মুসলমানদের অধীনে।

২. দ্বিতীয় ভাগে ১৬—২৫ নং পর্যন্ত ১০টি; এদের মধ্যে ১৬ ও ১৭ নং মুসলমানদের অধীনে, ১৬ নং জমিদারী এত বড় ছিল যে বর্ধমান ও রাজশাহী জমিদারীর পরেই এর স্থান।

১৮—১৯ এবং ২১ নং জমিদারের নাম উল্লেখ নাই।

২০ নং জমিদারী হিন্দুর অধীন।

২২ নং জমিদারী খালসার অধীনেই নয়।

২৩ নং বন্দর বালেশ্বর, অর্থাৎ বালেশ্বর বন্দরের আদায়কৃত শুল্ক। ইহা সরকারের খাস ছিল, কোন জমিদারের নাম নাই।

২৪ নং এ চুনাখালীর জমিদারী, হুগলী বন্দরের শুল্ক এবং টাকশালের শুল্ক একসঙ্গে ধরা হয়েছে। এদের মধ্যে চুনাখালীর জমিদার ছিলেন মুসলমান (তওয়ারীখ-ই-বাঙ্গালা দ্রষ্টব্য) এবং টাকশাল ও হুগলী বন্দর সরকারের খাস ছিল, কোন জমিদারের অধীন নয়।

২৫ নং এ মজকুরী নাম দিয়ে অনেকগুলি জমিদারীর উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এগুলিকে হিসাবের সুবিধার জন্য ২১ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (ডঃ আনিস একে ২১টি ছোট জমিদারী রূপে উল্লেখ করেছেন।) ডঃ আনিস বলেছেন যে এই ২১টি জমিদারীর ২টা মুসল্‌মানদের অধীনে ছিল। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেননি যে এখানে সকল জমিদারের নাম উল্লেখ করা হয় নি, জমিদারীর সংখ্যাও ঠিক ২১টি নয় এবং অনেক জমিদারী সরকারের খাস ছিল।

জাগীর অংশ সরকারী আলি, বন্দা ওয়ালা দরগাহ, আমীর-উল-ওমরা, ফৌজদারান, মনসবদারান, জমিনদারান, মদদ-ই-মাআশ, সালিয়ানাদারান, ইনাম আল-তমঘা, রোজিনাদারান, আমলা আলাম, আমলা নওওয়ারা এবং খেদা আফি-ইয়াল ইত্যাদি ১৩টি ভাগে বিভক্ত ছিল। অর্থাৎ জাগীর অংশ মোগলদের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের জাগীর এবং বিশেষ সামরিক কারণে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বিভাগ সমূহের এবং এমনকি লাখেরাজ ভূসম্পত্তিতেও বিভক্ত ছিল। জাগীর অংশে ১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে খাজনার পরিমাণ ছিল ৩৩,২৭,৪৭৭ টাকা। এই বিরাট ভূসম্পত্তির কথা ডঃ আনিস উল্লেখ করেন নি।

মোগল আমলে মুসলমান ও হিন্দু জমিদারদের তুলনামূলক সংখ্যা নিরূপণের জন্য (সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা হয়তঃ কোনদিন সম্ভব হবে না) মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে আরম্ভ না করে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় থেকেই আলোচনা শুরু করা দরকার। কারণ জাহাঙ্গীরের আমলেই বাংলা দেশে মোগল রাজস্ব ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু হয়। মিরযা নাথনের 'বাহরিস্থান-ই-গায়বী'তে জানা যায় যে জাহাঙ্গীরের সময় পরাভূত ভূঞাদিগকে স্ব স্ব জমিদারিতে বহাল রাখা হয় এবং এমনকি তাদের জমিদারী মোগল প্রথা অনুসারে জরীপও করা হয় না। (রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করেই ভূঞাদের এই অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হয়।)

সকলেই জানে যে ভূঞাদের মধ্যে মুসলমানরা বেশী প্রতিপত্তিশালী ছিল এবং তারা সংখ্যায়ও হিন্দুদের চাইতে কম ছিল না, বরং বেশী ছিল বলা চলে। নওয়াবী আমলে এসব ভূঞাদের উত্তরাধিকারীদের অবস্থা কি হয় তা গ্রন্থকার বিবেচনা করে দেখেননি। মোগল আমলে শাসন ব্যাপারে জমিদারদের স্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের অবকাশ আছে; বিতর্কমূলক সংজ্ঞা-গুলি বাদ দিলেও দ্বিধাহীন ভাবে বলা যায় যে নিয়মিত রাজস্ব আদায় করলে কোন জমিদারকে জমিদারীচ্যুত করা হত না। দুর্ভাগ্যবশতঃ মোগল আমলের রাজস্ব বিভাগীয় দলিল পত্রাদি আমাদের হস্তগত হয় নি, তাই এবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়; অন্ততঃপক্ষে গ্রন্থকার যেভাবে জমিদারী ক্ষেত্রে মুসলমানদের সচ্ছলতা নির্ধারণ করেছেন, তাতো নয়ই। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানেরা কি করে জমিদারী হারায় তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করার মত তথ্য এখনও পাওয়া যায়; দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সব তথ্যে গ্রন্থকারের প্রবেশ (access) ছিল না। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানী বাংলার দিওয়ানী স্বহস্তে গ্রহণ করে এবং ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৯৩ খ্রীঃ এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পর্যন্ত কয়েকবার ভূমি বন্দোবস্ত দেয়। এই সব বন্দোবস্তের ফলে সম্পূর্ণ দলিল, এমনকি জিলাওয়ারী ও প্রদেশওয়ারী জমিদারদের নাম, তাদের দেয় খাজনা, ইত্যাদির পূর্ণ তালিকা বিলাতের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। বিভিন্ন বন্দোবস্তের তালিকাগুলি তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার বুঝা যায়, —প্রত্যেক বন্দোবস্তে কয়জন পুরাতন জমিদার জমিদারী হারায় এবং কয়জন নূতন জমিদার তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। জমিদারের নাম দেওয়া থাকায় জমিদারীচ্যুত মুসলমান জমিদারদের সংখ্যাও নিরূপণ করা সম্ভব। এসব দলিলগুলি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে; কিন্তু আমি অন্য বিষয়ের গবেষণায় লিপ্ত থাকায় এবিষয়ে কোন তথ্য লিপিবদ্ধ করার সুযোগ পাই নি। কিন্তু আমার মনে হয় ১৭৭২-১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে অনেক মুসলমান জমিদার জমিদারীচ্যুত হয়েছে এবং তাদের জায়গায় ইংরেজ কোম্পানী ও কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী-পুষ্ট অনেক বানিয়া তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে অনেক হিন্দু পুরাতন জমিদারও জমিদারী হারিয়েছে। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দের কমিটি অব সারকিট

(Committee of Circuit) কর্তৃক প্রদত্ত ঢাকা চাকলার বন্দোবস্তের তালিকা-খানি আমি অনুশীলন করেছি ; এতে দেখা যায় যে ঢাকা চাকলার মুসলমান জমিদারদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। যদিও হিন্দু জমিদারদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা কম। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে কমিটি অব সারকিট জমি বন্দোবস্তের সময় পুরাতন জমিদারদের কোন সুযোগ-সুবিধা দেয়নি, বরং যারা বেশী টাকা খাজনা দিতে রাজী হয়েছে তাদেরকেই বন্দোবস্ত দিয়েছে। পদচ্যুত জমিদারদিগকে দেয় রাজস্বের মাত্র শতকরা ৫ টাকা হারে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সুতরাং ১৭৭২ সনের বন্দোবস্তেও অনেক পুরান জমিদার (হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই) জমিদারী হারায় এবং বানিয়া শ্রেণীর নতুন জমিদারেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। সুতরাং এবিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে ইণ্ডিয়া অফিসের উপরোক্ত দলিলাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ না করে শুধু দু'একজন আধুনিক লেখকের উপর ভিত্তি করে এক কথায় বলে দেওয়া যায় না যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে বা নওয়াবী আমলে মুসলমান জমিদারের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য ছিল বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমান জমিদাররা ক্ষতি-গ্রস্ত হয় নি।

গ্রন্থকারের দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য বিষয়, লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির ফলে মুসলমান এবং হিন্দুরা সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কারণ মুসলমানদের লাখেরাজ বাজেয়াপ্তের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের দেবোত্তর সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত হয় ; হিন্দুদের নগদ টাকা থাকায় তারা তাদের আর্থিক অবস্থা পূর্ণগঠন করতে সমর্থ হয়, কিন্তু দারিদ্র্যের ফলে মুসলমানরা তা করতে পারেনি। আপাতদৃষ্টিতে লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয়টি যুক্তিসহ, কিন্তু মুসলমানদের লাখেরাজের সঙ্গে হিন্দুদের দেবোত্তর সম্পত্তির তুলনা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ মুসলমানদের লাখেরাজ সম্পত্তি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল : প্রথমতঃ মুসলমান শয়খ, সুফী, আলেম, সৈয়দ ইত্যাদি বিদ্বজ্জনকে মোগল সম্রাট বা নওয়াব কর্তৃক প্রদত্ত লাখেরাজ বা নিষ্কর সম্পত্তি, যা তাঁরা পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করতে পারতেন। এইসব লাখেরাজ সম্পত্তি জাগীর, ইনাম, আল-তমঘা, আইমা, সুয়ুরগাল, মদদ-ই-মাআ'শ ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। বাদশাহ এবং নওয়াবরা হিন্দুদের

মধ্যে সাধক ও বিদ্বজ্জনকে এরূপ লাখেরাজ সম্পত্তি দান করতেন, কিন্তু সংখ্যায় হিন্দুরা মুসলমানদের তুলনায় অনেক কম ছিল। প্রকৃতপক্ষে এরূপ ভূসম্পত্তির মধ্যে, শুধু মুসলমানদের প্রদত্ত জমি পনরটি বিভিন্ন নামে এবং শুধু হিন্দুদের প্রদত্ত জমি তিনটি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল এবং মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের লোককে প্রদত্ত জমি নয়টি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ মুসলমান জমিদাররাও ধর্ম প্রতিষ্ঠানের জন্য যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা, সূফীদের দরগাহ বা কবর ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সম্পত্তি দান করত। হিন্দুদের দেবোত্তর সম্পত্তি শুধু এই দ্বিতীয় প্রকারের সম্পত্তির সঙ্গে তুলনীয়। সুতরাং বাজেয়াপ্ত হওয়ার ফলে মুসলমান ও হিন্দুরা সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি ; মুসলমান-দের লাখেরাজ সম্পত্তি হিন্দুদের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ সামরিক কার্য সমাধার জন্যও নওয়াবী আমলে অনেক জমি সামরিক অফিসারদের ভোগ দখলে যায় ; যদিও এগুলি মূলতঃ মোগলদের জাগীরের নামান্তর, নওয়াবী আমলে, বিশেষ করে, নওয়াব আলীবর্দী খানের আমলে এরূপ জাগীরগুলি চাকুরীর পরিবর্তে অফিসারদের পুরুষানুক্রমিক ভোগ দখলে চলে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, নওওয়রা, আমলা-ই-আলাম ইত্যাদি বিভাগগুলির নাম করা যায়। দিওয়ানী লাভের পরে পরেই এবং ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের আগেই এ বিভাগের জমিগুলি কোম্পানী কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয় ; কোম্পানীর শাসনের গোড়ার দিকের দলিল দস্তাবেজে এর অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির প্রশ্নে বিশদভাবে পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিল সমূহ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। এবং এসব দলিলাদির সাহায্যে বাজেয়াপ্তকৃত মুসলমান এবং হিন্দু সম্পত্তির খাঁটি পরিমাণও নির্ধারণ করা সম্ভব, এটা অবশ্য ঠিক যে নগদ টাকা থাকার ফলে বাজেয়াপ্তের পরে হিন্দুরা তাদের আর্থিক অবস্থা পুর্ণগঠিত করতে সক্ষম হয়, আর নগদ টাকার অভাবে মুসলমানরা তা পারেনি।

গ্রন্থকারের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রতিপাদ্য বিষয় হল, মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করা কোম্পানীর শাসনের নীতি ছিল না এবং মুসলমানেরাও ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল না এবং মুসলমানেরা ইচ্ছা করে

ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করেনি। প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে, এইগুলি এমন বিষয় যার সম্বন্ধে হঠাৎ কোন সদুত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের পরে যে-কোন বিষয় আলোচনা করার জন্য আমাদের প্রাথমিক তথ্য হল ইংরেজ কোম্পানীর রক্ষিত দলিল পত্র; তাদের দলিলে নিশ্চয়ই এমন কিছু পাওয়ার আশা করা যায় না, যাতে মুসলমানদের প্রতি তাদের নীতি নিশ্চয় করে বলা যাবে। অবশ্য ইংরেজদের প্রশাসনিক আইন কানুনেও মুসলমান বিদ্বেষের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তাই মনে হয় গ্রন্থকারের উক্তির প্রথমাংশ যথার্থ। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা হারবার পর মুসলমানরা ইংরেজদের প্রতি সন্দেহের চোখেই দেখত, এতে কোন সন্দেহ নাই। (অবশ্য স্বার্থান্বেষী মুসলমানদের কথা এখানে বাদ দিতে হয়; কারণ তাদের ধর্ম বা নীতি কিছুর বালাই নাই, তাদের ধর্ম বা নীতি হল স্বার্থ)। ডঃ আনিসুজ্জামান নিজে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের উল্লেখ করেছেন, নওয়াব শমস-উদ-দৌলার বিদ্রোহের কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এসব সর্বজনবিদিত বিদ্রোহ ছাড়াও ইংরেজদের দিওয়ানী লাভের গোড়ার দিকে আরও অনেক ছোটখাট বিদ্রোহের প্রমাণ পাওয়া যায়; যেমন বাংলা দেশের কয়েকজন ফৌজদার বিদ্রোহ করেছিলেন, এবং কয়েকজন মুসলমান জমিদার কোম্পানীকে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করেন। ইংরেজরা মুর্শিদাবাদের নওয়াবের নামে ফৌজদারদিগকে দমন করে এবং রাজস্ব আদায় করতে অস্বীকৃত জমিদারদের নিছক দুর্বৃত্ত এবং ডাকাত আখ্যা দিয়ে শায়েস্তা করে। এসব তথ্যও ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত Secret Consultations এবং Revenue Consultations-এ পাওয়া যায়।

গ্রন্থকার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে মুসলমানেরা ইংরেজী শিক্ষাবর্জন করেনি, বরং আর্থিক অসচ্ছলতাহেতু ইংরেজী শিক্ষালাভে সমর্থ হয় নি। এবিষয়ে তিনি ডঃ এ. আর. মল্লিকের উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ আছে। বর্তমান বিংশ শতাব্দীতেও ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের বিদ্বেষ আমরা নিজের চোখে দেখেছি। সুতরাং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে তারা ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিরূপ হবে না, একথা অবিশ্বাস্য। তা ছাড়া ডঃ মল্লিকের আলোচনায়ও পরিস্ফুট হয় যে শুধু আর্থিক দুর্বলতা

ছাড়া মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষা না করার অন্য কারণও ছিল। এখানে ডঃ মল্লিকের উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

P.178 "Consequently, they [the Government] adopted an extremely cautious attitude and advised the Committee [of the Calcutta Madrasah] that in all attempts at improvement they should endeavour to carry with them the voice of the educated classes of the community. Even what was useless, if highly prized, should not be hastily rejected. The Madrasah Committee was told that the selection of what is valuable in the works actually studied is naturally the first step in the introduction of an improved system of study."

P. 182 "Dr. Lumsdan had been an advocate of teaching Western Science in the Madrasah but had hesitated to act without specific orders from the government. But encouraged now by the emphatic declarations of the Examiners, he pressed the General Committee for a decided policy. He knew that the Committee was apprehensive of possible antagonism of the Muslims to any innovation, but from his long experience as Secretary of the Madrasah he was sure that they would not object to English as a medium of instruction in sciences. He now stressed his point to the Government and also suggested that a stipend of Rs. 8/- per month be given to students who took this course to help overcome any religious scruples."

PP.188-189 "The General Committee was convinced it was the proper object of the Madrasah "to combine the knowledge of English with high attainments in Mahomadan literature and science." This was a correct approach to the problem of giving English education to Muslim students for they were not prepared to forego the language and literature of their own culture. But the next action of the Madrasah sub-Committee in requiring all students to attend the English class was undoubtedly unwise. In February 1833, came another resolution to the effect that from that date the students would be expected to study English and that "an increase from two to five rupees per mensem, according to proficiency shall be made" on the result of the examination. It appears that at the annual examination of 1833, the number of boys fell from 87 to 45."

ডঃ. এ. আর. মল্লিকের বই থেকে অনেক বড় বড় উদ্ধৃতি দেওয়া হল কারণ বইখানি আমাদের গ্রন্থকার ডঃ আনিসুজ্জামান ব্যবহার করেছেন এবং মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে ডঃ মল্লিকের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। কিন্তু উপরোক্ত উদ্ধৃতির সাহায্যে বিকল্প সিদ্ধান্তেরও ইঙ্গিত দেওয়া যায়, যা গ্রন্থকার বিবেচনা

করে দেখেননি। প্রথমতঃ কলকাতা মাদ্রাসার কমিটি গোড়া থেকে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের বিরূপতার ভয় করত। কমিটি ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের প্রতি মুসলমানদের বিরোধিতার (antagonism) ভয় করত তাই অনেক ভেবে চিন্তে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন করে। কিন্তু সেক্রেটারী লামস্‌ডেন এর প্রভাবে সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষাব্রতী মুসলমান ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত বৃত্তির (Stipend) ব্যবস্থা করে। দ্বিতীয়তঃ মুসলমান ছাত্রেরা আরবী ও ফারসী অর্থাৎ ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহী ছিল, ধর্ম-শিক্ষা বাদ দিয়ে শুধু ইংরেজী শিক্ষায় তাদের কোন আগ্রহ ছিল না। সকল ছাত্রের জন্য ইংরেজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলেও মুসলমান ছাত্রেরা তার প্রতি নিরাসক্ততার ভাব দেখায়, যার ফলে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৮৭ থেকে ৪৫-এ নেমে আসে। গ্রন্থকার আর এক জায়গায় বলেছেন "দিল্লীতে যখন কোম্পানীর উদ্যোগে কলেজ স্থাপিত হয়, তখন স্থানীয় মুসলমানেরা এই কলেজে পড়বেন কি না, এ সম্পর্কে তাঁর কাছে [শাহ্‌ আবদুল আজিজের কাছে] "ফতওয়া" দাবী করেন। তিনি সেই প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদেরকে পড়তে উপদেশ দেন এবং বলেন যে সেটি ধর্মসিদ্ধ কাজ হবে।" (পৃঃ ২২) মুসলমানেরা যদি ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন না হয়, তা হ'লে হাতের কাছে এরূপ একটি কলেজ পেয়ে তাতে বিদ্যাশিক্ষা করতে যাওয়ার আগে মওলানা সাহেবের কাছে ফতওয়া চাইবেন কেন? আর্থিক দুর্গতির জন্য মুসলমানেরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি, একথা সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি তাদের বিরূপতাও ছিল; এই দুই কারণের সমন্বয়ে মুসলমানরা শিক্ষায় অনগ্রসর থেকে যায়।

একথা অনস্বীকার্য যে পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে মুসলমানেরা দৈন্য ও দুর্ভোগে পতিত হয়; মুসলমানদের এই আর্থিক দুর্গতির কারণ অনেকগুলি— যেমন প্রথমতঃ সামরিক বিভাগ কোম্পানীর হাতে চলে যাওয়ায় মুসলমান সেনানায়ক এবং সৈন্যেরা চাকুরী হারায়; এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ মুসলমানদের একটা বিরাট অংশ (এখানে বিরাট অংশ মানে শতকরা ৭০।৮০

জন) সামরিক বিভাগে নিযুক্ত থাকত। দ্বিতীয়তঃ প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগে সমূহেরও পুনর্গঠন হয়, ফলে আস্তে আস্তে ফৌজদার, সিকদার, কাজী, মুফতী ইত্যাদি উচ্চপস্থ কর্মচারীদের জীবিকার পথ বন্ধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের অগণিত অনুচরবৃন্দের। রাজস্ব বিভাগের পুনর্গঠন হওয়ার ফলে ঐ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও চাকুরী হারায় (অবশ্য মুসলমানরা রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদগুলিই অধিকার করত, নিম্ন চাকুরীগুলি যেমন, আমিন, কানুনগো, পাটওয়ারী ইত্যাদি সর্বদা পুরুষানুক্রমে হিন্দুদের অধিকারে থাকত) । গ্রন্থকার হয়ত একথা স্বীকার করেন, কারণ তিনি উইলিয়াম হান্টারের এ মত বর্জন করেন নি। এককথায় বলতে গেলে সামরিক, প্রশাসনিক, বিচার এবং রাজস্ব বিভাগে অর্থাৎ সকল বিভাগেই মুসলমানেরা চাকুরী হারায়। ইহা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এতে মোগল শাসনের কাঠামোই ভেঙ্গে যায় এবং ফলে মুসলমান অধিবাসীদের বৃহদংশ ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং জীবিকার পথ হারায়। নওয়াবী আমলের পূর্ব থেকে মুসলমান ব্যবসায়ীরাও বাংলা দেশের অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্যে বিশেষ তৎপর ছিল, এমন কি তারা মাঝে মাঝে ইউরোপীয় বণিক কোম্পানীদের সঙ্গে পাল্লা দিত। রাজনৈতিক ক্ষমতা ইংরেজ কোম্পানীর হস্তগত হওয়ার পর নানা কারণে এই সব ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা গুটাতে বাধ্য হয় ; অবশ্য এই ব্যবসায়ীদের অনেকই (এমনকি প্রায় সবাই) বিদেশাগত বলে মনে হয়, কিন্তু তারা অনেক দেশী লোককে ব্যবসায়ে খাটাত, সুতরাং তাদের ব্যবসা গুটানোর ফলে দেশী অনেক লোকের (অবশ্য হিন্দু-মুসলমান উভয়ের) জীবিকাও সঙ্কুচিত হয়। বাকী থাকে শুধু জমিদার এবং দেশের কৃষক ও শ্রমজীবী শ্রেণী। যদিও ডঃ আনিস স্বীকার করেন না, আমার মনে হয় ইংরেজদের দিওয়ানী লাভের পরে, প্রধানতঃ ইংরেজদের বন্দোবস্ত এবং লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির ফলে মুসলমান জমিদাররা সর্বস্বান্ত হয়। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় বাংলা দেশের মুসলমান আভিজাত্যের (aristocracy) কাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যায়। সুতরাং শুধু কৃষক এবং শ্রমজীবীদের দ্বারা হারানো কাঠামো ঠিক রাখা সম্ভব নয় ; শিক্ষাদীক্ষার প্রতি তারা কোন সময় আগ্রহান্বিত ছিল না, এখনও হয়নি। পুরানো অভিজাতশ্রেণীর লোকেরা

প্রথমে যতদূর সম্ভব আরবী ও ফারসী শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করে। ইংরেজীর প্রতি তাদের চেতনা ফিরে আসে অনেক পর ; তখন হিন্দুরা অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে।

উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার সঙ্গে পাটের চাষ বৃদ্ধির সংযোগ দেখিয়ে গ্রন্থকার একটি নূতন সংজ্ঞার দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মনে হয় সংজ্ঞাটি খুবই যুক্তিপূর্ণ, তবে এবিষয়ে আরো একটু আলোক-পাত করার প্রয়োজন রয়েছে। পাটচাষীদের মধ্যে মুসলমানদের এবং উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত মুসলমান ছাত্রদের আনুপাতিক হার বিচার্য। ১৮৭০ খ্রীঃ থেকে ১৮৮৫ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়ে সরকার মুসলমান সমাজে শিক্ষা প্রচারের জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল এবং শুধু মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার জন্য কয়েকটি মাদ্রাসা স্থাপন করেছিল। মুসলমানদের শিক্ষায় পাটচাষীর অবদান এবং সরকারী ব্যবস্থাদির অবদানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে। বৃটিশ আমলে বাংলা দেশের সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের প্রতিও গ্রন্থকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে "ইংরেজ-শাসনকালে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়। গ্রামকেন্দ্রিক স্বয়ং-সম্পূর্ণসমাজে ভাঙ্গন ধরে, জীবন যাত্রা হয়ে উঠে শহরমুখী আর অর্থ নৈতিক জীবনের মূল মাপকাঠি জমি থেকে রূপান্তরিত হয় মুদ্রায়। অর্থ নৈতিক কাঠামোর এই মৌলিক রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে নতুন শ্রেণী-বিন্যাস দেখা দেয়। নবগঠিত এই সব শ্রেণী আবার ঐতিহাসিক নিয়মানু-যায়ী নিজেদের ভূমিকা পালন করে সামাজিক অগ্রগতি সম্ভবপর করে তোলে।"

কয়েকটি সাধারণ ভুলের প্রতিও গ্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খান বাংলা দেশের মোগলদের স্থায়ী দিওয়ান রূপে নিযুক্ত হন (পৃঃ ৩)। কথাটা আমার কাছে পরিষ্কার হল না, কারণ আমরা বর্তমানে স্থায়ী অস্থায়ী বলে যা বুঝি, মোগল আমলে সে রকম কিছু ছিল না ; মোগল বাদশাহদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরেই স্থায়ী অস্থায়ী নির্ভর করত ! সে যাই হউক, মুর্শিদকুলী খান বাংলা দেশের প্রথম দিওয়ান নিযুক্ত হন ১৭০০ খ্রীঃ এবং ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকেন। ১৭০৮—১৭০৯ সাল

এই দুই বৎসর তিনি বাংলা দেশ ছেড়ে যান, কিন্তু ১৭১০ খ্রীস্টাব্দে আবার দিওয়ান নিযুক্ত হয়ে ফিরে আসেন ; ১৭১৫-১৬ খ্রীঃ তিনি সুবাদার নিযুক্ত হন (যদুনাথ সরকারের মতে তিনি ১৭১৭ খ্রীঃ সুবাদার নিযুক্ত হন। (এ বিষয়ে আমার Murshidquli Khan & His Times দ্রষ্টব্য) গ্রন্থকার আরও বলেন যে মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে বাংলার স্বাধীন নবাব-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। একথাটাও সত্য নয় ; জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মুর্শিদকুলী খান দিল্লীর বাদশাহের প্রতি অনুগত ছিলেন, বাদশাহই তাঁদের নিযুক্ত করেন। আলীবর্দী খানই সর্বপ্রথম নাদির শাহের আক্রমণের সুযোগ নিয়ে দিল্লীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

গ্রন্থকার বাংলা দেশের কৃষক ও শ্রমজীবীদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অনুমান করেছেন যে মুসলমান প্রধান বাংলাদেশে কৃষক ও শ্রমজীবীদের মধ্যেও মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল (পৃঃ ৯)। পরে এই অনুমানকে কোন তথ্য ব্যতিরেকে তিনি দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করেছেন (পৃঃ ২৯)। বর্তমানে অবশ্যই বাংলাদেশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, যার ফলে বাংলাদেশ ভাগ হয়ে পূর্বাংশ পাকিস্তানে যোগ হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠে বাংলাদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় কোন সময়ে ? আঠারশতকে সকলের ধারণা ছিল যে বাংলা-দেশে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ; ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন ১৭০৯-১০ খ্রীঃ হিন্দু ও মুসলমানের অনুপাত নির্ণয় করেছিলেন ১০০ : ১ রূপে। উনিশ শতকেও সাধারণ ধারণা ছিল যে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ; শুধু আদমশুমারীর পরেই সকলে আকস্মিক ভাবে জানতে পারে যে বাংলাদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। রিজলি সাহেব এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার ব্যাখ্যাও দিয়ে দিলেন, যার উত্তর দিতে হল খোন্দকার ফজলে রব্বিকে তাঁর 'হাকিকত-ই-মুসলমান-ই-বাংঙ্গালা' নামক পুস্তিকা লিখে। যাই হউক, বাংলা দেশকে মুসলমান প্রধান বলার আগে দেখতে হবে কোন সময়ের কথা বলা হচ্ছে, এবং সে সময়ে সত্যিই মুসলমানরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ ছিল কিনা ? প্রতিকূল সাক্ষ্যের অভাব নাই বলে এর প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

উপরের আলোচনায় দেখা যাবে যে মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা এবং আর্থিক দুর্বলতা সম্পর্কে ডঃ আনিসুজ্জামান কর্তৃক কয়েকটি প্রচলিত মত বর্জন

করার সঙ্গে আমরা একমত হতে পারিনি। এর ফলে অবশ্য ডঃ আনিসের বইখানির মূল্য কোন অংশে কমবে না, কারণ তাঁর বইখানি মূলতঃ সাহিত্যের আলোচনা ; ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও তাতে তাঁর গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্য কমবে না। তাছাড়া যে কোন মতামত গ্রহণ বা বর্জন করার স্বাধীনতাও তাঁর আছে। তিনি ঢাকায় বসে কাজ করেছেন, সুতরাং বিলাতস্থ ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরীর দলিলপত্রে তাঁর প্রবেশ ছিল না, সুতরাং আধুনিক লেখকদের উপর নির্ভর করা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না। ইণ্ডিয়া অফিসের হস্তালিখিত দলিলপত্রাদি পাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। এমন কি আঠার শতকের কয়েকজন বিখ্যাত ইংরেজ কর্মচারী লিখিত প্রামাণ্য গ্রন্থও তিনি দেখার সুযোগ পাননি। কিন্তু ঢাকায় পাওয়া যায় এরূপ কতকগুলি ছাপান দলিল ও ছাপান পুস্তকও গ্রন্থকারের দৃষ্টি এড়িয়েছে মনে হয়; উদাহরণ স্বরূপ Proceedings of the Committee Circuit, বিভিন্ন জিলার District Records, Colebrooke এবং Lambert এর Remark on the present state and husbandry of Bengal, সলিমুল্লাহর তওয়ারীখ-ই-বাঙ্গালা বা F. Gladwin কর্তৃক উক্ত পুস্তকের সার অনুবাদ ইত্যাদি।

ইংরেজ আমলে বাংলা দেশে মুসলমানদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ব্যাপক গবেষণা আজ পর্যন্তও হয়নি ; ইদানীং দু'একটা কাজ হচ্ছে, কিন্তু তাও এত মন্থর গতিতে যে খুব শীঘ্র এবিষয়ে পরিষ্কার ধারণা করা যাবে কি-না সন্দেহ। কাজটি ঐতিহাসিকদের এবং এ কাজে অবহেলা করার জন্য দায়ীও ঐতিহাসিকেরা। তবুও সাহিত্যসেবী ডঃ আনিসুজ্জামান যে সাহস করে একটা নূতন মতবাদ স্থাপনের চেষ্টা করেছেন তা প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত ; তবে সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে আরও ব্যাপক গবেষণা করে তাঁর মতবাদ জোরদার করার দায়িত্বও তিনি নিলেন।